PARTHASARATHI : RNI 5158/ 60: print format converted to web-magazine since 24.04.2020 during Nationwide Lockdown.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com

ষষ্ঠ অন্তর্জাল সংখ্যা

পই আশ্বিন, ১৪২৭ / 24.09.2020

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণ	প্রণব ঘোষ
সাধক কমলাকান্তের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
অহিংসার খোঁজে	শ্রী প্রকাশ অধিকারী
অনন্ত আশ্লেষ	সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

প্রীতি-কণা

"যদি কর্মে সফলতা আনতে চাও, ভাগ্যের দোষ দিও না। ভাগ্যকে গড়ে তোলো তোমার কর্মের দ্বারা। কর্ম করো পুরুষকার দিয়ে, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে; আর পূর্ণভাবে নির্ভর করো ঈশ্বরের উপর। তাঁর কৃপা লাভ করলে সব কিছুই সফল হবে।"

সংসারের নানা সমস্যার মধ্যেও আমাদের যে ভাবের আদান প্রদান ছিল তার প্রকাশ এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে। এর মধ্যে কোনোটির তারিখ দেওয়া আছে, কোনোটির তারিখ আজ আর এতো বছর পরে মনে করতে পারছি না। তবে শ্রী প্রীতিকুমারের চরিত্রের স্নেহময় দিকটা চিঠির মধ্যে ধরা পড়াতে অনেকেই তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের একটি ছবি এঁকে নিতে পারবেন।

২২/২/৫৬

প্রিয় শ্বেতা,

মাসীমা এলে খবর দিয়ো। তিনি যে কয়টি বই দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আমি তা নিশ্চয়ই পূরণ করব। সহজে এই ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি সত্যই খুব আনন্দ পাই। এমন ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করি ও খুশী হই। (বিষয়-মাসীমা ও সিনেমা)।

পড়াশুনায় গাফিলতি কোর না। এতে তোমার চাইতে ক্ষতি আমার। বিশেষতঃ পড়াশুনা যা করছ তা একান্তই আমার ভবিষ্যত কর্মজীবনের জন্য। এই কথা মনে রাখলে আমি খুশী ও আনন্দিত হব। এই ভাব পোষণ করলে নিশ্চয়ই পড়াশুনার ক্ষেত্রে অলসতা কেটে যাবে, নিজের ভিতরেও নূতন উদ্যম দেখা দেবে। (বিষয়-পড়াশুনা)

গান ভালবাসি ঠিকই। যারা গানকে ভালবাসে ও গাইতে পারে, তাদেরও ভালবাসি। তুমি সেই পর্য্যায়ে পড়েছ। বিশেষতঃ আমার ভাবের, কাজের ও চিন্তার সাথে যে গানের ও সুরের মিল থাকে সেখানে একটি নূতন মানুষ হয়ে যাই। তোমার আফশোষ করবার কিছু নেই। আমি

DO NOT COPY

অতি যত্ন সহকারে তোমাকে গান শেখাব। এ সহজ বিশ্বাস আমার উপর রাখতে পার। (বিষয়- গান বাজনা)।

সংবাদ যা দিয়েছ সেটি ঠিক তা নয়। উহা সুসংবাদের সূত্র ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা নিজে থেকে যখন কিছু করিনি তখন সব ভগবতীর কৃপায় হবেই। তখন সেই ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া ভাল। তাছাড়া যখন পিছিয়ে পড়ব না-তখন সব কাজ যত সত্বর মঙ্গলমত হয়ে সব দিক বজায় রাখে তাই ঠিক। (বিষয়- বিবাহ)।

মহাশয় এখন বাইরে খুব কমই বের হন। মাঝে মাঝে মহাশয় খুব নির্বিকার ভাব করে থাকেন। নিতান্ত ঘর হতে লক্ষ্মীশূন্য না হলে বাড়ীর বাইরে যান না। ভাগ্যের হেরফেরে হয়তো ১১এ তে যেতে পারেন। সব খবরই এক প্রকার দিলাম। পত্রের উত্তর দিলে খুশী হই, কারণ পত্রের আশায় থাকি। তুমি ফুরি, ঝুরি, খুকি নিয়ে ও পড়াশুনা কলেজ নিয়ে ব্যস্ত থাক ও সময় কাটাও। আমি যে নিতান্ত বেচারা হয়ে পা দোলান ছাড়া আর কোনও কাজ পাই না।

ভালবাসা নিও। ইতি -

প্রীতিকুমার

*****

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৪
(০৩.১০.১৯৫৭) কলিকাতা

সাথী,

আজ শুভ ঁবিজয়া। আজ মহামিলনের দিন। দূরে থাকলেও হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে উপলব্ধি করতে হবে। আনন্দের দিনে আমার অফুরন্ত ভালবাসা তুমি অন্তর দিয়ে ও মনে প্রাণে উপলব্ধি কর ও গ্রহণ কর। তোমার সংসার যাত্রাপথে থাকলো আমার আশীর্বাদ। কর্মময় জীবনে তুমি প্রেমময়ী ও আনন্দময়ী হয়ে ওঠ। তোমার জীবন হয়ে উঠুক আদর্শ, হয়ে উঠুক কর্মময় ও কর্ত্তব্যময়। সুনন্দনকে দাও আমার স্নেহ চুম্বন। আশীর্বাদ করি ও যেন মহৎ কাজের ও মহৎ ভাবের উপযুক্ত হয়। ও এই জগত সংসারে শ্রেষ্ঠ মানুষ হোক। ও প্রতিটি মানুষের ভিতর সত্যের বর্ত্তিকা জ্বেলে দিক।

বাসার খবর এক-প্রকার ভালই..। এবার পূজায় কোথাও বেড়াতে বের হইনি। বন্ধুরা সব এসেছিল। ঘরে বসে গল্প করেছি। কেবল নবমীর দিন দক্ষিণেশ্বরে মাকে দর্শন করতে গেছিলাম। রাস্তায় অসম্ভব ভীড়। মনে হয় লোকের আনন্দের সীমা নেই। গতবারের থেকে পূজা কিছু কম মনে হোল। তাছাড়া মাইক ও বাদ্যযন্ত্র তেমন এবার নেই।

তোমরা কদিন ঠাকুর দর্শন করলে? বাবুয়া কি মায়ের দর্শন লাভ করতে পেরেছে? এখন কি খুব হাসে? ওকে মাঝে মাঝে উপুড় করে দিও। নিয়মিত দুধ একটু বেশী করে খাওয়াবে। যত বড় হবে, ক্ষুধাও তত বাড়বে। সে অনুপাতে খাওয়ান দরকার .....।

তোমাকে কিছু টাকা পাঠিয়েছি। সামান্য টাকা বলে রাগ কোর না। শীঘ্রই টাকা পেলে M.O. করব।

পূজায় কেমন কাটালে জানাবে। বাবুয়ার সব খবর দিও। .....

আমার ভালবাসা নাও। ইতি –

তোমার প্রীতিকুমার

*****

DO NOT COPY

(তারিখ নেই)

প্রিয় শ্বেতা,

কথা দেওয়া তো হয়ে গেছে প্রথম দিন, তুমি যেখানেই থাক, যত অবহেলাই কর আমাকে, যত ব্যথা ও দুঃখ আসুক, আমি তা গ্রহণ করব আনন্দের সঙ্গে। তুমি কি এর মধ্যে ভুলে গেছ আমি যা বলেছি? এ দেহ যতদিন আছে ততদিন তো আছি, তাছাড়াও থাকবো ছায়ার মতো। মনে আছে সেদিন দুপুরে বলেছিলাম নিত্য কত বাধা-বিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, কত শত্রু পিছনে ঘোরে, কত অপমান সহ্য করতে হয়? তাই আগে আগে প্রবল ইচ্ছে হোত আত্মহত্যা করতে। একবার ট্রেনের নিচে পড়তে গেছিলাম। সে প্রায় দশ বছর আগের কথা। আর সেদিন নিজের ঘরে। কিন্তু আজ সব দুঃখ ব্যথা যেন দমকা হাওয়ার মতো আসে আর চলে যায়। যেমন আসে তেমনি মিলিয়ে যায় ঐ বিরাটের গর্ভে। আর তখনই মনে হয় তুমি সর্বদা কাছে আছ, আছ সাথে। তাই আজ এ সুখের দিনে মরতে ইচ্ছে হয় না। বারবার মনে হয় জগৎকে যেন নতুন জীবনের মধ্যে কত কত রূপেই না পাবো!

কথা কতই হবে। হোক, তাতে দুঃখ করার কিছু নেই। আমরা ঠিক থাকলে হোল। সমস্ত কিছুই তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই হবে।

ভালবাসা নিও। ইতি

তোমার প্রীতিকুমার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান দয়া প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের কথা শুনে একবার তাঁকে দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়ীতে উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগরও যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে কথা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তিনি (ঈশ্বর) কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?" উত্তরে ঠাকুর বলেন, "তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হ'লে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়, আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য)। তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে – অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মানো কিনা?" মৃদু হাস্যে বিদ্যাসাগর সে কথা মেনে নিয়েছিলেন। না মেনে উপায় কই? এযে অনস্বীকার্য। তবে কোন শক্তি মানুষের নিজস্ব নয়, ঈশ্বরের শক্তি মানুষে প্রকাশ, যেমন সূর্যের আলো দর্পণে প্রতিফলিত। সাধকদের জীবনে অনেক অলৌকিক যোগ বিভূতির প্রকাশ ঘটে। ঠাকুরের জীবনে তেমন অলৌকিকতার প্রকাশ কম। কেননা তিনি এগুলিকে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলে মনে করতেন। তবে তিনি যে কখনো কোন অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেননি, এমন নয়। করেছেন, কিন্তু খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে যেন অলৌকিক ঘটনা বলে চেনাই যায় না।

পরমপূজনীয় লাটু মহারাজ প্রথম জীবনে ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের গৃহভৃত্য ছিলেন। কোন এক রবিবারে রামবাবুর সঙ্গে দক্ষিনেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান। পশ্চিমের বারান্দায় তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছেলেটাকে তুমি বুঝি সঙ্গে করে

DO NOT COPY

এনেছ, রাম? একে কোথায় পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।" তারপর ঠাকুর নিজের ঘরে প্রবেশ করে ঈশ্বর প্রসঙ্গ শুরু করেন। লাটু মহারাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের কথা শুনছিলেন – "যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথর চাপা ফোয়ারা। মিস্ত্রী এখানে ওখানে ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গায় চাপাটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর ফর করে জল বেরুতে থাকে।" এই কথা বলতে বলতে ঠাকুর হঠাৎ লাটুকে ছুঁয়ে দিলেন। অমনি তাঁর রোমাঞ্চ হল, ঠোঁটদুটি ঘন ঘন কাঁপতে লাগল এবং চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রু ঝরতে লাগল। রামবাবু বাড়ি যাবার আগে ঠাকুর লাটুকে আবার স্পর্শ না করা পর্যন্ত তিনি ওই একইভাবে ছিলেন। ঠাকুরের স্পর্শে তিনি আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন। ঘটনাটি ঠাকুরের গুরুশক্তির প্রকাশ।

রামবাবুর অনুরোধে স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) ঠাকুরের কাছে এলে তাঁকেও তিনি অনুরূপভাবে স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী দেখেন সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরতে ঘুরতে যেন কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে। নিখিল বিশ্বের সঙ্গে তাঁর আমিত্ব যেন মহাশূন্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অর্ধজ্ঞান শূন্য হয়ে স্বামীজী বলতে লাগলেন, "তুমি আমায় কি করলে, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমার যে বাপ মা আছে!" এ কথা শুনে ঠাকুর হাসতে লাগলেন, পরে হাত দিয়ে স্বামীজীর বুক ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, "তবে এখন থাক, একবারে কাজ নেই – কালে হবে।" কি আশ্চর্য সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন কোন ব্যাক্তির মনকে কাদার তালের ন্যায় ভাঙ্গা-গড়া কি কোন সাধারণ লোকের কাজ?

অন্য আর একদিন ঠাকুর স্বামীজীকে নিয়ে মন্দিরের পাশে যদুনাথ মল্লিকের বৈঠকখানায় উপস্থিত হন। সেদিনও তিনি স্বামীজীকে হঠাৎ স্পর্শ করতেই স্বামীজী বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ঐ অবস্থায় স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর জেনে নেন তিনি কে, কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন এবং কতদিনই বা ইহজগতে থাকবেন। জ্ঞান ফিরে এলে স্বামীজী দেখেন ঠাকুর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এবং মৃদুমধুর হাসছেন। যে শক্তিবলে ঠাকুর এ কাজ করেছিলেন তা আর যাই হোক লৌকিক শক্তি নয়।

ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় যখন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ছিলেন তখন একদিন রামবাবু বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার কৈলাশনাথ বসুকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন একবার ঠাকুরকে দেখেন। ডাক্তার বসু উত্তরে বলেছিলেন, "রাম, তোমার পরমহংস যদি ভাল হয় তো ভাল, নইলে তার কান মলে দেবো।" এ শর্তে রাজি হয়ে রামচন্দ্র তাঁকে কাশীপুরে নিয়ে যান। উপরে ওঠার আগে তিনি কিছুক্ষণ পুকুরের চাতালে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে খবর দিল যে বাবুটি ঠাকুরের কান মলে দেবেন বলেছেন, তাঁকে তিনি উপরে নিয়ে যেতে বলেছেন। যে লোকটি ডাকতে এসেছিল সে তো ডাক্তার বসুকে চেনেনা। তাই অবাক হয়ে খুঁজতে লাগল এবং ইতস্ততঃ করে ঐ কথাগুলো বলতে লাগল। লোকটির মুখে ঐ কথাগুলো শুনে ডাক্তার বসু তো রীতিমত আশ্চর্য। তিনি ভাবতে লাগলেন, "শিমলাতে ঘরের ভেতর বসে রামের সঙ্গে পরমহংসের বিষয়ে যে কথা হয়েছিল কাশীপুরের বাগানে সে সংবাদ এখনি কি করে এলো?"

এরপর তিনি সসম্ভ্রমে উপরে ওঠেন এবং ভক্তিভরে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। ঠাকুরের এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তিনি ঠাকুরকে গুরু বলে গ্রহণ করেন এবং এরপর তাঁর ফটোতে প্রণাম না করে কখনো বাড়ির বার হতেন না।

ঠাকুরের শরীর থেকে মাঝে মাঝে একটা আভা বার হতো এবং সে আভায় চারিদিক পূর্ণ হয়ে যেত। সেই আভার স্পর্শে সকলে দেহজ্ঞান হারিয়ে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ভাবে থাকতেন। স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা যেন মনে

DO NOT COPY

স্থান পেত না। স্বামীজীর মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

"তখনকার দিনে এতো ডাক্তারখানা ছিল না। শিমলা অঞ্চলে 'বাঘওয়ালা ডাক্তারখানা'ই এক প্রধান ডাক্তারখানা ছিল। এক ব্যক্তির বাইশ বছরের একটি ছেলের টাইফয়েড অসুখ করিয়াছিল। টাইফয়েড রোগে তখন লোকে বড় একটা বাঁচিত না। লোকটি প্রেসক্রিপশন লইয়া , হন্তদন্ত হইয়া, ডাক্তারখানায় ওষুধ আনিতে যাইতেছিল। লোকটিকে দেখিতে কালোপানা; দোহারা, লম্বা-চওড়া চেহারা। বয়স পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ হইবে। লোকটি আমাদের পাড়ার নয়। আমরা তাহাকে চিনিতাম, কিন্তু তাহার সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় ছিল না। বোধহয় তাহার বাড়ি ছিল জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। সড়ক দিয়া যাইলে ওষুধ আনিতে অনেক দেরি হইবে সেইজন্য সে সিংহীদের পুকুর-পাড় দিয়া, রামদাদার বাড়ির সম্মুখের গলি দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছিল। রামদাদার বাড়ির দরজায় আসিয়া দেখিল যে, রাস্তায় বেঞ্চি পাতিয়া অনেক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, যেন বাড়িতে লোকজন খাওয়ান হইবে। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এখানে কি গো?" উপস্থিত একজন বলিলেন, "এখানে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই এসেছেন।" লোকটি বলিল, "কোনটি?" তখন তাহাকে বলা হইল যে, গালিচার উপরে যিনি বসিয়া আছেন তিনিই হইতেছেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই। লোকটি রাস্তা হইতে জানালার গরাদের ভিতর দিয়া খানিকক্ষণ উঁকি মারিয়া দেখিল। ঠিক সেই সময় পরমহংস মশাই-এর গা হইতে আকর্ষণী শক্তি বাহির হওয়াতে যেমনই তাহা অচেনা লোকটির গায়ে লাগিল, অমনি সে অভিভূত হইয়া পড়িল। ভিতরে বসিবার আর জায়গা ছিল না, কাজেই সেই লোকটি বাহিরে বসিয়া রহিল। তাহার পর সকলে যখন তেতলায় খাইতে গেল সেও দ্বিধা না করিয়া খাইতে গেল। আহার করিয়া সকলে নামিয়া আসিল। রাত্রে যখন পরমহংস মশাই ফিরিয়া গেলেন এবং সকলে যে-যার বাড়িতে যাইতে লাগিল, তখন তাহার হুঁশ হইল যে, রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে, তাহাকে ওষুধ আনিতে যাইতে হইবে। ডাক্তারখানা হয়তো বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বাড়ির লোকেরাই বা কি ভাবিবে!"

গৌরীমাও একবার ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে ছিলেন। গৌরীমা সর্বপ্রথম ঠাকুরের কথা শোনেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধের কাছে। তিনি বলেছিলেন, "মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলুম এক অসাধারণ মানুষ – অপরূপ রূপ, জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢলঢল, ঘনঘন সমাধি।" দ্বিতীয়বার শোনেন বলরাম বসুর কাছে। পুরী থেকে ফিরে তিনি যখন বলরামবাবুদের বাড়িতে ওঠেন তখন বলরামবাবু তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের সাধু দর্শনে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। গৌরীমা উত্তরে বলেছিলেন, "জীবনে অনেক সাধু দর্শন হয়েছে, দাদা, নতুন কোন সাধু দর্শনের সাধ আমার নেই। তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান – তার আগে আমি যাচ্ছিনে।" দক্ষিণেশ্বরে বসেই ঠাকুর নিশ্চয়ই এ কথা শুনেছিলেন এবং অচিরেই গৌরীমাকে আকর্ষণও করেছিলেন। একদিন তাঁর নিত্যপূজিত দামোদর শিলা সিংহাসনে রাখতে গিয়ে গৌরীমা দেখেন সেখানে দুখানি জীবন্ত চরণ অথচ দেহের বাকী অংশ দেখা যায় না। দামোদরকে তুলসী দিলে দেখা গেলো তুলসী গিয়ে পড়েছে ঐ চরন দুখানিতে। গৌরীমা এরপর জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। তিন চার ঘন্টা এইভাবে থাকার পর যখন তাঁর জ্ঞান হল তখন তিনি অনুভব করলেন কে যেন তাঁর হৃদয়কে সূতোয় বেঁধে টানছে। রাত্রি ভোর না হতেই তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হন। বলরামবাবু অবশ্য তাঁকে একা যেতে দেননি। সস্ত্রীক তিনি গৌরীমাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। তখন সবে সকাল হয়েছে। ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে তাঁরা দেখলেন ঠাকুর আপন মনে সূতো জড়াচ্ছেন এবং গাইছেনঃ

DO NOT COPY

"যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি
সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি শ্যামা?
একবার নাচ গো শ্যামা!" ইত্যাদি

তাঁরা ঘরে ঢুকলেন এবং ঠাকুরের সূতো জড়ানোও শেষ হল। ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে গৌরীমা দেখলেন সিংহাসনের জীবন্ত চরনযুগল ও ঠাকুরের শ্রীচরণদ্বয় এক এবং অভিন্ন।

ঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত বৈকুন্ঠনাথ সান্যালের জীবনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটিও রীতিমত অলৌকিক। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ঠাকুর 'কল্পতরু' হয়ে অনেক ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন। বৈকুন্ঠনাথও কৃপা পেয়ে ধন্য হন। তিনি এসে ঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বলেন, " মশায়, আমায় কৃপা করুন।" ঠাকুর বলেন, "তোমার তো সব হয়ে গেছে।" এ কথায় সন্তুষ্ট হলেও তিনি সবিনয়ে বলেন, "আপনি যখন বলছেন হয়েছে তখন নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। তবে আমি যাতে অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তা করে দিন।" এ কথায় ঠাকুর 'আচ্ছা' বলে ক্ষণেকের জন্য সামান্যভাবে তাঁর বুক স্পর্শ করলেন মাত্র। তার প্রভাবে কিন্তু সান্যাল মশায়ের অন্তরে ভাবান্তর উপস্থিত হল। আকাশ, বাড়ি, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি দৃশ্যমান সকল বস্তুর মধ্যেই তিনি ঠাকুরের হাস্যদীপ্ত মূর্তি দেখতে লাগলেন। প্রবল আনন্দে উল্লসিত হয়ে তিনি সবাইকে ডাকতে লাগলেন। কয়েকদিন ধরে এই ভাব একটানা চলতে লাগল; শুধু নিদ্রার সময় বাদে। কিন্তু সর্বক্ষণ এই অবস্থায় থাকা যায় না। অফিসে বা কর্মান্তরে যেখানেই যান না কেন সবকিছুর মধ্যেই ঠাকুরের হাস্যোজ্বল মুখখানি প্রতিবিম্বিত। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হতে লাগল তিনি বুঝি পাগল হয়ে যাবেন। নিজের চেষ্টায় দর্শন বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে শেষে ঠাকুরেরই শরণাপন্ন হলেন। করজোড়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন, "প্রভু, আমি এই ভাবধারণে অক্ষম, যাতে এর উপশম হয় তা করে দিন।" কি আশ্চর্য! প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাব ও দর্শনের বিরাম হয়ে গেল।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেও সশরীরে অন্যত্র উপস্থিত হতে পারতেন – এই ঘটনার প্রমাণ আছে। ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘরে খিল দিয়ে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চিন্তা করতে করতে হঠাৎ ঠাকুরের দর্শন পান। ঠাকুর সত্যিই সেখানে উপস্থিত, না ব্যাপারটি তাঁর মাথার খেয়াল, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তিনি ঠাকুরের হাত পা নিজের হাতে টিপে দেখেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সামনেই তিনি ঘটনাটি খুলে বলেন। এই ঘটনার পরেই মনে হয় গোঁসাইজী ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ চিনতে পারেন। সেদিন সবার সামনেই তিনি বলেছিলেন, "দেশ-বিদেশ পাহাড়-পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখলাম, কিন্তু (ঠাকুরকে দেখিয়ে) এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, তারই কোথাও দু আনা, কোথাও এক আনা, কোথাও এক পাই, কোথাও আধ পাই মাত্র; চার আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।" পরে ঠাকুরকে বলেন, "... অতি সহজ হয়েই আপনি যত গোল করেছেন। কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর। যখনই ইচ্ছা তখনই এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি।... যদি কোন পাহাড়ের চূড়োয় বসে থাকতেন, আর পথ হেঁটে অনাহারে গাছের শিকড় ধরে উঠে আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তাহলে আমরা আপনার কদর করতাম। এখন মনে করি ঘরের পাশেই যখন এই রকম, তখন না জানি বাইরে দূর দূরান্তরে আরও আরও কতো ভাল ভাল সব আছে। তাই আপনাকে ফেলে ছুটোছুটি করে মরি আর কি!"

ঠাকুরের এই দিব্যশক্তি কিন্তু সিদ্ধাই নয়। তিনি সিদ্ধাই প্রয়োগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কেননা সিদ্ধাই ঈশ্বর লাভের পথে অন্তরায়। তিনি ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "হে অর্জুন, যতদিন অষ্টসিদ্ধির একটিও অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন তোমার

DO NOT COPY

কিছু শক্তিবৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু আমাকে পাবে না।” ঠাকুর জীবনে কখনও সিদ্ধাইয়ের আশ্রয় নেননি, শুধু তাই নয়, অনেকের সিদ্ধাই হরণও করেছেন।

ইন্দেশের গোরী পণ্ডিত একবার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তাঁর একটি সিদ্ধাই ছিল। কোন তর্কসভায় প্রবেশের সময় তিনি উচ্চৈস্বরে কয়েকবার “হা রে রে রে, নিরালম্ব লম্বোদরজননী কং যামি শরণম্” উচ্চারণ করতেন। জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত কথাগুলি শুনলে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হতো। কুস্তিগীর পালোয়ানেরা যেমন বাহুতে তাল ঠোকে তেমনি তাল ঠুকতে ঠুকতে সভায় প্রবেশ করে পা মুড়ে আসরে বসে যখন গোরী পণ্ডিত তর্ক শুরু করতেন তখন তাকে পরাজিত করা কারো সাধ্যে কুলাত না। একবার গোরী পণ্ডিত ‘হা রে রে রে’ করে কালীবাড়িতে প্রবেশ করছিলেন। তা শুনে ঠাকুর আরও জোরে ‘হা রে রে রে’ করে উঠলেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ ধরে দু পক্ষের ‘হা রে রে রে’ চলল। এই চিৎকার শুনে কালীবাড়ির দারোয়ানেরা সব লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এলো। পরে অবশ্য তারা সব কিছু দেখেশুনে হাসতে হাসতে বিদায় নেয়। কিন্তু গলার জোরে ঠাকুরকে অতিক্রম করতে না পেরে গোরী পণ্ডিত বিষণ্ণ হয়ে পড়েন এবং ধীর মন্থর পদে কালীবাড়িতে প্রবেশ করেন। ঠাকুর বলেছিলেন, “তারপর মা জানিয়ে দিলেন, গৌরী যে শক্তি বা সিদ্ধাইয়ে লোকের বল হরণ করে নিজে অজেয় থাকত, সেই শক্তির এখানে ওইরূপে পরাজয় হওয়াতে তার ঐ সিদ্ধাই থাকল না। মা তার কল্যাণের জন্যে তার শক্তিটা (নিজেকে দেখিয়ে) এর ভেতর টেনে নিলেন।”

ঠাকুর কর্তৃক সিদ্ধাই হরণের আরও ঘটনা আছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর চন্দ্র ও গিরিজা নামে দুইজন শিষ্য ছিলেন। দুজনেরই সিদ্ধাই ছিল। ঠাকুর তাদের সিদ্ধাই হরণ করেন। গিরিজা প্রসঙ্গ নীচে উল্লেখ করছি।

ঠাকুর একদিন গিরিজার সঙ্গে শম্ভু মল্লিকের বাগানবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। শম্ভুবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অনেক সময় কেটে যায়। গিরিজাকে নিয়ে ঠাকুর যখন কালীবাড়িতে ফেরার উদ্যোগ করেন তখন রাত এক প্রহর। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সঙ্গে লন্ঠনও নেই। গিরিজা হাত ধরলেও ঠাকুরের পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। ঠাকুরের কষ্ট দেখে গিরিজা বললেন, “দাদা, একবার দাঁড়াও। আমি তোমায় আলো দেখাচ্ছি।” এই বলে তিনি পিছন ফিরে দাঁড়ালেন এবং তাঁর পিঠ থেকে জ্যোতির একটা লম্বা ছটা বেরিয়ে পথ আলোকিত করল। সে আলোয় কালীবাড়ির ফটক পর্যন্ত বেশ দেখা যেতে লাগল এবং ঠাকুরের পথ চলতে কোন অসুবিধা হল না।

পরে এই প্রসঙ্গে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “কিন্তু ঐ ক্ষমতা আর বেশিদিন রইল না। এখানকার (তাঁর নিজের) সঙ্গে থাকতে থাকতে ঐ সকল সিদ্ধাই চলে গেল। (নিজের শরীর দেখিয়ে) মা এর ভেতর তাদের (চন্দ্র ও গিরিজার) কল্যাণের জন্যে তাদের সিদ্ধাই বা শক্তি আকর্ষণ করে নিলেন। তারপর তাদের মন আবার ঐসব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল।”

DO NOT COPY

চান্নার সাধনপীঠ এবং দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরই ছিল সাধক কমলাকান্তের প্রিয় আবাসভূমি।

কমলাকান্ত ছিলেন তন্ত্রমন্ত্রের সাধক। তিনি কবি, সাধক, সংসারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ।

কমলাকান্তের শ্যামাসংগীতে একসময় বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো। এখনো তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীত ভক্ত ও সাধক গণের কণ্ঠে নিনাদিত হয়।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ কমলাকান্তের রচিত শ্যামাসংগীত গাইতেন। অন্য কেউ গাইলে তিনি তা তন্ময় হয়ে শুনতেন।

সাধক কমলাকান্ত রামপ্রসাদের মতই মাতৃ আরাধনায় আজীবন কাটিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন রামপ্রসাদেরই উত্তরসূরী।

ভবতারিণীর সামনে এক একদিন রামকৃষ্ণ ভাবের ঘোরে বলতেন, মা, তুই রামপ্রসাদকে, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি নে?

মাতৃ আরাধনায় সিদ্ধ হন সাধক কমলাকান্ত। তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়েছে অনেক অলৌকিক লীলা। তার মধ্যে কিছু কিছু এখানে পরিবেশন করছি।

বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র ছিলেন কমলাকান্তের শিষ্য। তিনি গুরুকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। গুরুর গুণগরিমায় এমন মুগ্ধ হয়ে যান যে তাঁর পুত্র প্রতাপচাঁদকে পাথিয়ে দেন গুরুদেবের কাছে যাতে সে গুরুর পুণ্য ও পবিত্র গুণময় সান্নিধ্য লাভ করে জীবনে প্রকৃত উন্নতি করতে সক্ষম হয়।

প্রতাপচাঁদ কমলাকান্তের কাছে এলে তিনি যথানিয়মে তান্ত্রিক আচারে তাঁকে অভিষিক্ত করেন।

ক্রমশঃ রাজকুমার সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল হলেন। তিনি প্রায়ই শ্মশানে থাকতেন ও কারণ বারি পান করতেন। অতিরিক্ত কারণ বারি পান করার ফলে ক্রমশঃ মাতাল হয়ে পড়লেন প্রতাপচাঁদ।

তাঁর মাতলামির খবর চারিদিকে রটে গেলো। মহারাজও শুনলেন। তিনি তখন ছুটে এলেন কমলাকান্তের ইষ্টদেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে। তিনি ভাবলেন, তাঁর গুরুর সান্নিধ্যে এসে তাঁর ছেলে এমনধারা হয়েছেন। সুতরাং গুরুর সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাওয়া উচিত।

কালীমন্দিরের সামনে আসতেই মহারাজা দেখলেন মাতাল হয়ে সাধক কমলাকান্ত শ্মশান থেকে ফিরছেন। অতিরিক্ত কারণবারি পান করার ফলে তাঁর চোখ দুটি রক্তজবার মতো লাল হয়ে উঠেছে। তিনি চলছেন। হাতে রয়েছে সুরার পাত্র। সেই সঙ্গে গানও গাইছেনঃ

সদানন্দময়ী কালি!
মহাকালের মনমোহিনী গো মা।
তুমি আপনি সুখে আপনি নাচ।
আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না গো মা
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?
সবেমাত্র তুমি যন্ত্রী,
যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি,
যেমন বলাও তেমনই বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত

DO NOT COPY

দিয়ে বলে গালাগালি –
এবার সর্বনাশি ধরে অসি
ধর্মাধর্ম দুটোই খেলি।

কমলাকান্তের কন্ঠে এমন মধুর সঙ্গীত শুনে ক্ষণিকের জন্য তন্ময় হয়ে যান মহারাজ। তাঁর মুখে কথা সরে না। বাহ্যজ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছেন।

হঠাৎ তাঁর চমক ভাঙলো। তিনি ভাবলেন, যে জিনিষের জন্য আমি এখানে এসেছি তাতো করা হল না। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেই তো আমার ছেলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত।

গম্ভীর কন্ঠে প্রশ্ন করলেন, ঠাকুর, একি সব কাণ্ড আপনি এখানে করছেন? আমার ছেলে প্রতাপকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছিলুম এই আশায় যে আপনার সাহচর্যে থেকে সে একজন যোগ্য মানুষ হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন দেখছি তার উল্টো। আপনার সঙ্গে থেকে সে একটা পাঁড় মাতাল হয়ে উঠেছে। যুবরাজ সম্বন্ধে যে সব খবরাখবর আমার কানে পৌঁছেছে তা যে সত্যি তা আমার বুঝতে বাকি নেই।

কমলাকান্ত সহাস্যে বললেন, মহারাজ, কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করে আপনি একথা বলছেন?

মহারাজ জোরের সঙ্গে বললেন, ঠাকুর, আপনার হাতের এই মদের ভাঁড়ই যে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে উৎকট মদের গন্ধ পাচ্ছি।

মহারাজার কথা শুনে অবাক হলেন সাধক কমলাকান্ত। তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, মহারাজ, কে বলেছে আপনাকে যে এ ভাঁড়ে মদ আছে? দেখুন, এই ভাঁড় যে দুধে ভরা।

মহারাজা ক্রোধের বশে এগিয়ে এলেন সাধকের কাছে। তাঁর সঙ্গে এলেন পাত্র-মিত্র এবং কর্মচারীরা। সকলে তাকিয়ে দেখলেন সাধকের হাতে ভাঁড়টি। দেখলেন, ঐ ভাঁড়ে মদ নেই, রয়েছে দুধ।

সকলে অবাক হলেন। কিন্তু মহারাজার মন থেকে সন্দেহ ভাব একেবারে চলে গেল না। তিনি কমলাকান্তকে বললেন, ঠাকুর, এ যদি দুধই হয়, তবে তো এ থেকে মাখন তৈরি করা যাবে? বেশ, আজ তাই আমরা সকলে দেখবো।

কমলাকান্ত তখন মদের ভাঁড়টি তাদের হাতে দিলেন।

পরে ওরা ঐ দুধ হতে মাখন তুললো। সেই মাখন গালিয়ে ঘি তৈরি করা হলো। ঐ ঘি দিয়ে কমলাকান্ত মন্দিরে বসে মায়ের হোম করলেন। তারপর কমলাকান্ত মহারাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, এবার তো আপনার সন্দেহ গেলো। দেখলেন তো ঐ ভাঁড়ে মদ ছিল না, ছিল দুধ।

এতক্ষণে মহারাজার মন থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। তিনি উপলব্ধি করলেন, গুরুদেব আজ তাঁরই মঙ্গলের জন্য, বিশ্বাস জাগাবার জন্য এমন অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ করেছেন।

সিদ্ধ গুরুকে অবিশ্বাস করা যে অন্যায় তা তিনি এবার বুঝতে পারলেন। তার জন্য তাঁর মনে অনুশোচনা দেখা দিলো।

পরে তাঁর পুত্র সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাও চলে গেলো। পুত্র সংসার ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন।

দিনদিন সাধক কমলাকান্তের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এমন কি বাংলার বাইরেও। সুদূর বারাণসী ধামের বাঙ্গালী অধিবাসীরা তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও অলৌকিক বিভূতির কথা জানতে পারলেন। তাঁরা কমলাকান্তকে কাছে পাবার জন্য ব্যগ্র হলেন। সেবার বারোয়ারী কালী পূজোর সময় কমলাকান্তের ডাক পড়লো বারাণসীতে।

DO NOT COPY

কমলাকান্তের একান্ত বাসনা ছিল যে তিনি একবার বারাণসী ধামে যাবেন। দেখে আসবেন বাবা বিশ্বনাথ এবং মা অন্নপূর্ণাকে। এবার সেই সুযোগ এসে গেলো।

যথাসময়ে কমলাকান্ত গেলেন বারাণসী ধামে। মাঝরাতে শ্যামাপুজোয় বসলেন কমলাকান্ত। পুজোয় বসে মন্ত্র বা মাতৃনাম উচ্চারণ না করে গাইছেন শ্যামাসঙ্গীত আর সেই সঙ্গে পান করছেন কারণবারি।

তাই দেখে একশ্রেণীর দর্শক ক্ষেপে উঠলেন। উদ্যোক্তারা তাদের বোঝালেন, কমলাকান্ত যে সে মানুষ নন। তিনি হচ্ছেন সিদ্ধ পুরুষ। তিনি আমাদের তুলনায় বেশি বোঝেন কিভাবে মায়ের পুজো করতে হবে বা হবে না। কিন্তু সকলে তাদের যুক্তি মেনে নিলেন না। কয়েকজন শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠলেন, বামাচারী নাম নিয়ে কত লোক তো এ ধরনের পুজো করে থাকে। কিন্তু মুর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে ক'জন? কমলাকান্ত যদি সত্যিই মৃন্ময়ী মুর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাহলে বোঝা যাবে তাঁর ক্ষমতা কতখানি।

একজন স্পষ্টবক্তা এগিয়ে এসে বললেন, ঠাকুর, কারণ পান ও মত্ততা তো অনেক হলো! কিন্তু তাতে করে মাটির প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠল কোথায়? কেবল লোক দেখানো ঢং দেখিয়ে কি লাভ?

কমলাকান্তের দু'নয়ন মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল। গর্জে উঠলেন তিনি, বটে, তবে সত্যিই দেখতে চাও মাটির প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠে কিনা?

ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কমলাকান্ত তুলে নিলেন বলিদানের খাঁড়াটি। তারপর সেটির দ্বারা প্রতিমার হাতে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাটা অংশ থেকে রক্তধারা ঝরে পড়তে লাগলো। তাই দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে সমালোচকের দল লুটিয়ে পড়লেন কমলাকান্তের শ্রীচরণে।

একবার কমলাকান্ত শিষ্যবাড়ী থেকে ফিরছেন। যাবেন চান্না গ্রামে। অদিকে বেলা পড়ে এসেছে। সন্ধে হতে বেশী দেরি নেই। সামনেই ওড়গাঁয়ের বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা। এখানে ঠেঙাড়ে ও ডাকাতদের উৎপাত বড্ড বেশী। কখনও পথচারীদের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়, আবার কখনও কখনও তাদের মেরে ফেলে।

ক্রমশঃ সন্ধে হয়ে আসছে। সাধক কমলাকান্ত তাড়াতাড়ি পথ দিয়ে চলেছেন। রুক্ষ কাঁকরভরা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। আশপাশে কোন গাছপালা বা বসতবাড়ি বলতে কিছু নেই। বহুদূরে দু'একটা তালগাছ দেখা যাচ্ছে। কমলাকান্ত দ্রুতবেগে হেঁটে চলেছেন। তাঁর পদক্ষেপ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ক্রমশঃ। একসময় কমলাকান্তের কানে ভেসে এলো আতঙ্কজনক কণ্ঠস্বর; হা-রে-রে-রে ! ঐ শব্দ শুনে ভয়ে থমকে দাঁড়ালেন কমলাকান্ত। সামনের দিকে এগোতে আর সাহস পেলেন না।

ক্রমশঃ ডাকাতেরা ঘিরে ফেলল কমলাকান্তকে। তাদের হাতে ছিল সড়কি ও লাঠি। ডাকাতসর্দার গর্জে উঠলো, ওরে ঠাকুর, তোর কাছে যা কিছু আছে শিগগীর ফেলে দে। কমলাকান্তের হাতে ছিল একটা পুঁটলি। শিষ্যবাড়ি থেকে তিনি যা কিছু জিনিস পেয়েছিলেন সেগুলি বেঁধে রেখেছিলেন ঐ পুঁটলির ভিতর। ট্যাঁকে ছিল কয়েকটি টাকা। সেগুলি ডাকাত-সর্দারের সামনে রেখে কমলাকান্ত বললেন, নে বাবারা, যা ছিল সব তোদের দিয়ে দিলুম। গরীব বামুন আমি। আর তো কিছু সঙ্গে নেই।

ডাকাত-সর্দার সেই জিনিষগুলি আত্মসাৎ করে বাজখাঁই গলায় বলতে লাগলো, ঠাকুর, তাতো হলো। এবার বল তো কোন গাঁয়ে যাবে? তোমার নাম কি?

কমলাকান্ত বললেন, আমি যাব চান্না গ্রামে। আমার নাম কমলা কান্ত দেবশর্মা।

কমলাকান্তের কথা শুনে ডাকাত-সর্দার প্রমাদ গুনলে। ভাবলে, চান্না তো কাছেই। এখুনি ও ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা রটিয়ে দিলে আমাদের সর্বনাশ হবে। তার চেয়ে ওকে গাঁয়ে ফিরতে না দিয়ে এখানে এই মুহূর্তে শেষ করে ফেলা উচিত।

DO NOT COPY

এই ভেবে ডাকাত-সর্দার কমলাকান্তকে মেরে ফেলার জন্য নিজের মনকে তৈরী করে ফেললে। তার মনের সেই কথা জানালে কমলাকান্তকে, ঠাকুর, তোমাকে নিয়ে তো আমাদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। তুমি থাকো চান্না গ্রামে। সেটা এখান থেকে মাত্র ক্রোশ তিনেকের পথ। এত কাছে বাস করছ অথচ তোমাকে আমরা ছাড়তে পারি না। ছেড়ে দিলেই আমাদের সর্বনাশ হবে। তুমি গ্রামে গিয়ে ওখানকার লোকজনদের কাছে আমাদের কথা বলবে। তখন আমাদের আর রক্ষে থাকবে না। এর মধ্যে তুমি বোধহয় আমাদের দু-একজনকে চিনেও নিয়েছ। সুতরাং তোমাকে আমরা জলজ্যান্ত ফিরে যেতে দেব না। তোমাকে আমরা মেরে ফেলব। তুমি তার জন্য তৈরী হও।

ডাকাত-সর্দারের কথা শান্ত চিত্তে মেনে নিলেন সাধক কমলাকান্ত। তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, বেশ তো বাবা, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই হবে। তবে মরবার আগে আমাকে একবার মায়ের নাম নিতে দাও। এতে তোমাদের কোন আপত্তি নেই তো?

রাজী হল ডাকাত-সর্দার। বললো, তুমি গান গাও আর আমরাও আমাদের কাজের জন্য তৈরী হতে থাকি।

কমলাকান্ত মাটিতে আসন করে বসলেন। ডাকাতরা তাঁকে ঘিরে রইলো। তিনি আবেগভরা কণ্ঠে গাইতে লাগলেন শ্যামাসংগীত-

আর কিছুই নাই শ্যামা-মা তোর
কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারি
দেখে হ'লাম সাহস ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা
সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদকালে কোথা নাই-
ঘর বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে রাখ,
করুণা নয়নে দেখ,
নইলে জপ ক'রে যে তোমায় পাওয়া
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা,
মাকে বলি মনের ব্যথা।
আমার জপের মালা ঝুলি-কাঁথা,
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা।

কি সুন্দর সংগীত গাইলেন কমলাকান্ত। ডাকাতরা তন্ময়চিত্তে শুনলে সেই অপূর্ব মন-মাতানো হৃদয়-জুড়ানো শ্যামাসংগীত।

দেখতে দেখতে তাদের মনে এলো পরিবর্তনের তরঙ্গ।

সংগীত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাত-সর্দার ও অনুচররা জড়িয়ে ধরলে সাধক কমলাকান্তের পুণ্য শ্রীচরণযুগল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললে, ঠাকুর, আমরা মহাপাতকী। আমরা না বুঝে তোমার সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলুম। তুমি আমাদের আশ্রয় দাও। তুমি আমাদের বাঁচাও। আজ তোমার চোখেমুখে যেন মায়ের করুণার আলো দেখতে পেলুম। তুমি আমাদের কৃপা করো।

সেদিন ডাকাতরা মায়ের নামে জয়ধ্বনি করে উঠল। দেখতে দেখতে ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা মাতৃনামে ও গানে মুখর হয়ে উঠলো।

কালে ঐ ডাকাতদল রূপান্তরিত হল পরম সাধকদলে। এমনি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল সাধক কমলাকান্তের।

DO NOT COPY

অহিংসার খোঁজে

শ্রী প্রকাশ অধিকারী

পশু নাকি আদিতে ছিলাম ---
এখন মানুষ বিবর্তনের পথ বেয়ে;
আমাদের রক্তে তাই আজও
পশুত্বের গোপন অধিষ্ঠান।

যতই বড়াই করি সভ্যতার ---
যতই মনুষ্যত্বের করি ঘোষণা
হিংসা আর জিঘাংসা মাঝে মাঝেই
চাগাড় দিয়ে ওঠে সজ্ঞান স্বভাবে।

অহিংসা আসলে সভ্যতার পোষাকী নাম –
তাই, আমাদের আদিম রক্ত লোলুপতা
আমাদের হিংস্রতার বৈধতার আপাত শোভন
আড়াল খোঁজে যুক্তি-তত্ত্বের মোহময় বিস্তারে।

ধর্ম-যুদ্ধ, ক্রুসেড, জেহাদ, শ্রেণী-সংগ্রাম –
আরও কত যুক্তিজালের ফাঁদ পেতে
ডেকে আনে হত্যার পরম্পরা নররক্ত পান
কখনও শাসক, কখনও শাসিতের সক্রোধ আস্ফালনে।

একেই সভ্যতা বলে।

অনন্ত আশ্লেষ

সুনন্দন ঘোষ

যখন নিঃসঙ্গতা
নিঃশ্বাসে করেছি বিষপান,
কখনও কাঙাল আমি
কখনও মহতোমহীয়ান।

মৃত্যু যত কাছে আসে
মৃত্যুভয় দূরে চলে যায়,
শরীরে জরার স্পর্শ
উষ্ণ ঠোঁট আবেগ হারায়।

ক্রমশঃ শীতল মুঠি
তবুও শক্তির অবশেষ।
এই শরীরের শেষে
শুরু হবে অনন্ত আশ্লেষ।

DO NOT COPY